بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ জুন, ২০১৯ মোতাবেক ২১ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত যায়েদ বিন হারেসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম আর এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছিল যে, হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়। আমি বলেছিলাম, এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করার মতো আরো কিছু কথা রয়েছে। বিয়ের সময় হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বয়স ছিল ৩৫ বছর। আরবের পরিবেশের দৃষ্টিকোন থেকে এ বয়স এমন ছিল যেটিকে মধ্যবয়স বা পৌঢ় বয়স বলা উচিত। হযরত যয়নব অত্যন্ত মুত্তাকী, ধর্মপরায়ণা ও সম্পদশালীনি মহিলা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যে, মহানবী (সা.)-এর সকল স্ত্রীদের মাঝে কেবল যয়নবই সেই স্ত্রী ছিলেন যিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, আর তার সমকক্ষতার দাবি করতেন; এর কিছুটা উল্লেখ পূর্বে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা তার ব্যক্তিগত খোদাভীতি ও পবিত্রতার অনেক প্রশংসা করতেন এবং অধিকাংশ সময় বলতেন, যয়নব অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবতী নারী আমি দেখি নি। আরো বলতেন যে, তিনি অনেক মুত্তাকী, পুণ্যবতী, অনেক বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, অনেক দান-খয়রাতকারী এবং পুণ্য ও ঐশী নৈকট্য লাভ হয় এমন কর্মে গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনাশীল ছিলেন। তবে কিছুটা রাগী স্বভাবের ছিলেন কিন্তু রাগ প্রকাশের পর অতিদ্রুত তিনি অনুতপ্ত হয়ে পড়তেন। দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে তাঁর যে মর্যাদা ছিল তাহলো, হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) আমাদের বলেন,

اسرعكن لحاقا بى اطولكن يدا অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা আমার মৃত্যুর পর সে সর্ব প্রথম মৃত্যু বরণ করে আমার কাছে পৌঁছবে। হযরত আয়েশা বলেন, আমরা হাত বলতে আক্ষরিক অর্থেই হাত নিয়ে নিজেদের হাত মেপে দেখতাম। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পর সর্বপ্রথম যয়নব বিনতে জাহাশের মৃত্যু হলে আমাদের কাছে এর অর্থ স্পষ্ট হয় যে, এখানে হাতের অর্থ দান-খয়রাতের হাত ছিল, বাহ্যিক হাত নয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরো লিখেন,

যেমনটি আশঙ্কা করা হয়েছিল, হযরত যয়নবের বিয়েতে মদীনার মুনাফেকদের পক্ষ থেকে অনেক আপত্তি করা হয় আর তারা প্রকাশ্যে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে নিজ পুত্রবধুকেই যেন নিজের জন্য বৈধ করে নিয়েছেন। কিন্তু এই বিয়ের উদ্দেশ্যই যেহেতু আরবের অজ্ঞতাপূর্ণ এই রীতির অবসান ঘটানো ছিল তাই এই বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য শোনা বা সহ্য করাও অবশ্যম্ভাবী ছিল।

এখানে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইবনে সা'দ এবং তাবরী প্রমুখ (ঐতিহাসিকেরা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন একটি হাদীস উল্লেখ করেছে। এর ফলে যেহেতু মহানবীর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের

ধারকবাহক সত্তার বিরুদ্ধে আপত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাই কয়েকজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক এই হাদীসটিকে একান্ত ঘৃণ্য রূপে উপস্থাপন করে নিজেদের পুস্তকের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে।

হাদীসটি হলো, যায়েদের সাথে যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে দেয়ার পর মহানবী (সা.) কোন কারণে যায়েদের খোঁজে তার বাড়ি যান। ঘটনাক্রমে যায়েদ বিন হারেসা তখন বাড়িতে ছিলেন না। অতএব দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েই মহানবী (সা.) যায়েদকে সম্বোধন ডাকলে যয়নব ভেতর থেকে উত্তর দেন যে, তিনি বাড়িতে নেই আর একই সাথে মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠ চিনতে পেরে তিনি তড়িঘড়ি করে উঠে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি ভেতরে আসুন। কিন্তু মহানবী (সা.) অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হন।

এই বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করছেন যে, হযরত যয়নব তখন তড়িঘড়ি করে এমন অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যে, তার শরীরে ওড়না ছিল না আর ঘরের দরজাও খোলা ছিল, তাই মহানবী (সা.) এর দৃষ্টি তার ওপর পড়ে আর নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) তার সৌন্দর্য দেখে এই শব্দমালা পড়তে পড়েতে ফিরে যান যে, **سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب** অর্থাৎ পবিত্র সেই আল্লাহ্ যিনি মহান এবং পবিত্র সেই আল্লাহ্ যার হাতে মানুষের হৃদয়, যেদিকে চান সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেন। যায়েদ বিন হারেসা ফিরে এলে যয়নব তাকে মহানবী (সা.)-এর আগমনের ঘটনা জানান। তিনি (সা.) কী বলেছেন যায়েদ তা জানতে চাইলে, উত্তরে তিনি তাঁর (সা.) এর সেই শব্দমালাও শোনান। হযরত যয়নব মহানবী (সা.)-এর সেই শব্দমালা বর্ণনা করেন এবং বলেন, আমি তাঁকে (সা.) ভেতরে আসার অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যান। যায়েদ একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সম্ভবত যয়নবকে আপনার পছন্দ হয়েছে। আপনি চাইলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি আর আপনি তাকে বিয়ে করে নিন। মহানবী (সা.) বললেন, যায়েদ! খোদাকে ভয় কর এবং যয়নবকে তালাক দিও না। কিন্তু এই বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যায়েদ যয়নবকে তালাক দিয়ে দেন। এটি সেই রেওয়ায়েত ইবনে সা'দ এবং তাবরী প্রমুখ এ ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছে। যদিও এই রেওয়ায়েতের এমন ব্যাখ্যাও করা যায় যা কোনভাবে আপত্তিকর হতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই ঘটনা আপাদমস্তক সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং মিথ্যা, আর রেওয়ায়েত এবং বর্ণিত বিষয় তথা সকল দিক থেকে এটি যে মিথ্যা তা সুস্পষ্ট। রেওয়ায়েতের দৃষ্টিকোন থেকে কেবল এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, এই কাহিনীর বর্ণনাকারীদের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াকদী আর আব্দুল্লাহ্ বিন আমের আসলামীর সংশ্লিষ্টতা দেখা যায় আর এই উভয় ব্যক্তি গবেষকদের মতে একেবারেই দুর্বল এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। এমনকি ওয়াকদী তো নিজের মিথ্যা বর্ণনা এবং মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে এতটা কুখ্যাত যে, সম্ভবত মুসলমান রাভীদের মাঝে তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, এর বিপরীতে সেই রেওয়ায়েত যা আমরা নিয়েছি, যাতে যায়েদের মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে যয়নবের অশোভন আচরণের অভিযোগ করার কথা বলা হয়েছে, (এটি পূর্ববর্তী খুতবায় বর্ণনা করা হয়েছিল) আর এর মোকাবিলায় মহানবী (সা.)-এর এই উক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছিল যে, তুমি খোদা তা'লাকে ভয় কর এবং তালাক দিও না। এটি বুখারীর হাদীস যা শত্রু-মিত্র সবার কাছে পবিত্র কুরআনের পর ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে সঠিক রেকর্ড মনে করা হয় আর যার বিপক্ষে কখনো কোন আপত্তিকারীর আঙুল তোলার সাহস হয় নি। অতএব হাদীস

বর্ণনার নীতি অনুসারে উভয় রেওয়ায়েতের মর্যাদা ও মূল্য স্পষ্ট। অনুরূপভাবে যুক্তিগত দিক থেকেও প্রণিধান করলে ইবনে সা'দ প্রমুখের বর্ণনা ভুল হবার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না, কেননা যখন এ কথা স্বীকৃত যে, যয়নব মহানবী (সা.) এর ফুফাতো বোন ছিলেন, এমনকি তিনি (সা.)-ই তার ওলী তথা অভিভাবক হয়ে যায়েদ বিন হারেসার সাথে তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন আর অপর দিকে এ বিষয়টিও কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, তখন পর্যন্ত মুসলিম মহিলারা পর্দা করতো না বরং পর্দা বিষয়ক প্রারম্ভিক আদেশ হযরত যয়নব এবং মহানবী (সা.)-এর বিবাহের পর অবতীর্ণ হয়েছিল; এমতবস্থায় এটি মনে করা যে, যয়নবকে মহানবী (সা.) পূর্বে কখনো দেখেন নি, কেবল তখনই ঘটনাক্রমে চোখ পড়ে গিয়েছিল আর তিনি (সা.) তার প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন -এটি এক সুস্পষ্ট ও নির্জলা মিথ্যা আর এর চেয়ে বেশি এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। অবশ্যই এর পূর্বে তিনি (সা.) হাজার হাজার বার যয়নবকে দেখে থাকবেন আর তার দৈহিক সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য যা-ই ছিল, তা তাঁর (সা.) কাছে প্রকাশিত ছিল আর ওড়নাসহ দেখা বা ওড়না ছাড়া দেখার মাঝে যদিও কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু সম্পর্ক যেখানে এর কাছের আর পর্দার প্রথা ও আদেশও তখন পর্যন্ত প্রচলিত হয় নি আর নিত্যদিন দেখা-সাক্ষাৎও হতো, তাই একথার সমূহ সম্ভাবন থাকবে যে, তিনি (সা.) একাধিকবার তাকে ওড়না বিহীন অবস্থায়ও দেখে থাকবেন। আর যয়নবের তাঁকে (সা.) ভেতরে প্রবেশ করার অনুরোধ করা এ কথা স্পষ্ট করে যে, তখন মহানবী (সা.) এর সম্মুখে আসার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ যতটা পোশাক প্রয়োজন তা তার (অর্থাৎ যয়নবের) দেহে অবশ্যই ছিল। অতএব যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এই ঘটনা কেবল একটি মিথ্যা আর বানোয়াট গল্প অভিহিত হয় যার মাঝে কোন সত্যতা নেই। আর যদি এসব প্রমাণের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর সেই পরম পবিত্র এবং জগৎবিমুখ জীবনকেও দৃষ্টিতে রাখা হয় যা তাঁর প্রতিটি গতি-স্থিতি তথা কর্মকাণ্ড থেকে সুস্পষ্ট তাহলে এই নোংরা এবং বাজে রেওয়ায়েতের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণেই গবেষকরা এই ঘটনাকে সুনিশ্চিতভাবে মিথ্যা এবং মনগড়া আখ্যা দিয়েছেন। যেমন- আল্লামা ইবনে হাযার ফাতহুল বারীতে, আল্লামা ইবনে কাসীর তার তফসীরে, আল্লামা যুরকানী তার শারহে মাওয়াহেব-এ স্পষ্টভাবে এই বর্ণনাকে নির্জলা মিথ্যা আখ্যা দিয়ে এর একান্ত উল্লেখ করাকেই সত্যের অপলাপ বলে মনে করেছেন। আর অন্যান্য গবেষকদেরও একই মত। কেবল গবেষকরাই নয় বরং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যাকে বিদ্বেষ অন্ধ করে দেয় নি, সে এই বর্ণনাকে যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও লিখেছেন যে, আমরা পবিত্র কুরআন আর সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে সংকলন করে উপস্থাপন করেছি, সেই অর্থহীন এবং অগ্রহণযোগ্য বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দিবে যেটিকে কতক মুনাফেক নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে বর্ণনা করেছে আর মুসলিম ঐতিহাসিকগণ, যাদের কাজ ছিল কেবল সকল প্রকার রেওয়ায়েত একত্রিত করা, তারা কোন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ বা গবেষণা ছাড়াই নিজেদের ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন আর পরবর্তীতে কতক অমুসলিম ঐতিহাসিক ধর্মীয় বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে সেটিকে নিজেদের পুস্তকের সৌন্দর্য বানিয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, এই বানোয়াট কাহিনির ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও মনে রাখা আবশ্যক, এটি ইসলামী ইতিহাসের সেই যুগ ছিল যখন মদীনার মুনাফেকদের দৌরাত্ম ছিল চরম পর্যায়ে আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের নেতৃত্বে ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে দুর্নাম করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল। তাদের রীতি ছিল , মিথ্যা এবং মনগড়া গল্প

তৈরি করে গোপনে ছড়াতো অথবা প্রকৃত বিষয় একরকম হতো আর তারা তাতে রং চড়িয়ে এবং এর সাথে শতপ্রকার মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে তা গোপনে ছড়ানো আরম্ভ করত। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে যেখানে হযরত যয়নবের বিবাহের উল্লেখ রয়েছে সেখানে এর পাশাপাশি মদীনার মুনাফেকদেরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর তাদের দুস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

(সূরা আহযাব: ৬১)

অর্থাৎ যদি মুনাফেকরা আর তারা যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে আর মদিনায় মিথ্যা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সংবাদ প্রচারকারীরা তাদের এই কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হয় তাহলে হে নবী! আমরা তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিব আর এরপর তারা মদিনায় অবস্থানের অনুমতি হারাবে কেবল অল্প সংখ্যক ব্যতীত।

এই আয়াতে নীতিগতভাবে এই কাহিনির মিথ্যা হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর যেমনটি পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে অর্থাৎ এর সমসাময়িক যুগে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটেছে আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার অসৎ সহচররা এই অপবাদকে এমনভাবে রটিয়েছে এবং এমন এমন রঙ লাগিয়ে এটিকে প্রচার করেছে যে, মুসলমানদের জন্য শান্তি ও কল্যাণের যুগ ম্লান হয়ে গেছে এবং কতিপয় দুর্বল প্রকৃতি ও অজ্ঞ মুসলমানও এদের এই নোংরা অপপ্রচারের শিকারে পরিণত হয়। মোটকথা, এই যুগটি মুনাফেকদের বিশেষ দৌরাত্মের যুগ ছিল এবং তাদের সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র ছিল, মিথ্যা ও নোংরা সংবাদ রটিয়ে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্টদের দুর্নাম করা। আর এসব সংবাদ এমন চতুরতার সাথে সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হতো যে, অনেক সময় মহানবী (সা.) এবং তাঁর জ্যৈষ্ঠ সাহাবীরা বিস্তারিত জানা না থাকার কারণে এসব অপপ্রচার প্রতিরোধ করারও সুযোগ পেতেন না আর ভেতরে ভেতরে তাদের এই বিষ ছড়িয়ে পড়তো। এমন পরিস্থিতিতে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় মুসলমান যারা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত ছিলেন না এসব কথাকে সত্য মনে করে তা বর্ণনা করা আরম্ভ করতেন আর এভাবে এসব রেওয়ায়েত ওয়াকদীর মতো মুসলমানদের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু যেমনটি বলা হয়েছে, সহীহ হাদীসসমূহে এসবের নামগন্ধও পাওয়া যায় না এবং হাদীস বিশারদগণ এগুলোকে গ্রহণও করেন নি।

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের ঘটনায় স্যার উইলিয়াম ম্যূর, যার কাছ থেকে বিচক্ষণতা আশা করা হতো, ওয়াকদীর ভুল ও মনগড়া রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করা ছাড়াও এ স্থলে এই মর্মপীড়াদায়ক হামলা করেছে (সে আপত্তিকারী ছিল তাই তার কাছ থেকে এমনটিই আশা করা যায় আর সেইসাথে মুসলমানদেরও যদি উক্তি থাকে তাহলে তারা আরো বেশি বিদ্রূপ করার সুযোগ পেয়ে যায়) যে যেন বয়স বাড়ার পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রবৃত্তির কামনা বাসনাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নাঊযুবিল্লাহ্। আর তাঁর (সা.) স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা বহু বিবাহের কারণ হিসেবে ম্যূর সাহেব এই কামনাবাসনাকেই দায়ী করছেন অর্থাৎ তিনি মনে করেন, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কারণেই তিনি এসব বিয়ে করেছেন, নাঊযুবিল্লাহ্। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, আমিও একজন ঐতিহাসিক হিসাবে কোন ধরনের ধৈর্মীয় বিতর্কে না জড়িয়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করছি। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ভুল খাতে প্রবাহিত করতে দেখে এই অনুচিত ও অনৈতিক পন্থার বিরুদ্ধে কথা না বলে পারছি না।

সুতরাং ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতার পাশাপাশি, যেক্ষেত্রে একজন প্রকৃত মুসলমান ও খাঁটি মু'মিন নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারে- যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তও এই অপ্রিতিকর বিষয়ের অসারতা প্রমাণ করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মহানবী (সা.) একাধিক বিয়ে করেছেন আর এটিও সর্বজন স্বীকৃত ইতিহাসের অংশ যে, তিনি (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)কে ছাড়া অন্য সব বিয়ে এমন বয়ঃসন্ধিতে করেছেন যাকে বৃদ্ধ বয়স বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনরূপ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া বরং স্পষ্ট ও দিবালোকের ন্যায় প্রাঞ্জল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের বিপরীতে এই ধারণা করা যে, মহানবী (সা.)-এর এসব বিয়ে নাঊযুবিল্লাহ্ দৈহিক কামনা-বাসনার বসবর্তী হয়ে হয়েছে- একজন ইতিহাসবিদের মর্যাদা পরিপন্থী এবং এক ভদ্র-শালীন মানুষকেও শোভা পায় না। ম্যুর সাহেব এই বাস্তবতা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না যে, মহানবী (সা.) পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্ক এক পৌঢ় বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই সম্পর্ককে এত সুন্দরভাবে ও এমন বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এরপরও পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত কার্যত তিনি এক স্ত্রী-ই রেখেছেন। আর এই স্ত্রী অর্থাৎ হযরত সওদাও কাকতালীয়ভাবে একজন বিধবা এবং পৌঢ় বয়সের মহিলা ছিলেন। আর এই পুরো সময়ে, যা দৈহিক কামনা-বাসনার উত্তেজনার বিশেষ যুগ, তিনি কখনো দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবেন নি। ম্যুর সাহেব এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কেও মোটেই অনবহিত নন যে, মক্কাবাসীরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁকে নিজেদের জাতিগত ধর্মকে বিনষ্টকারী জ্ঞান করে তাঁর কাছে উতবা বিন রাবীআকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছিল, আর মহানবী (সা.)-এর কাছে জোরালোভাবে আবেদন করেছিল যে, আপনি আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন আর এর বিনিময়ে ধন-সম্পদ ও রাজত্বের লোভ দেখানো ছাড়া এই আবেদনও করেছিল যে, আপনি যদি কোন সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করে আমাদের প্রতি প্রীত হন আর আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলা এবং এই নতুন ধর্মের প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পারেন তাহলে আপনি যে মেয়েকে চান আমরা তার সাথে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। তখন মহানবী (সা.)-এর বয়সও তেমন বেশি ছিল না আর নিঃসন্দেহে দৈহিক শক্তিও পরবর্তীকালের তুলনায় ভালো অবস্থানে ছিল। কিন্তু তিনি (সা.) মক্কার সরদারদের এই প্রতিনিধিকে যে উত্তর দিয়েছেন তা-ও ইতিহাসের এক উন্মুক্ত পৃষ্ঠা যার পুনরাবৃত্তি করার এখানে প্রয়োজন নেই। আর সেই ঐতিহাসিক ঘটনাও ম্যুর সাহেবের দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। অর্থাৎ মক্কার লোকেরা মহানবী (সা.)-কে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন অতিউত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ মনে করতো। কিন্তু এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ম্যুর সাহেবের এমনটি লেখা যে, পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর যখন একদিকে তাঁর দৈহিক শক্তিতে স্বাভাবিকভাবে ক্রমশ ভাটা পড়ছিল আর অপরদিকে তাঁর কর্মব্যস্ততা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, এক চরম ব্যস্ত মানুষের ব্যস্ততাও এর সামনে কিছুই নয়,; তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে তিনি কি বিলাসিতায় মগ্ন হতে পারেন? অতএব এটিকে কোনভাবে পক্ষপাতমুক্ত মন্তব্য মনে করা যেতে পারে না। নিশ্চিতরূপে এটি বিদ্বেষে ভরা মন্তব্য। বলতে চাইলে তো কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা বলতে পারে আর তার মুখ ও কলম বাধাগ্রস্ত করার শক্তিও অন্যের থাকে না কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের উচিত, অন্ততঃপক্ষে এমন

কথা যেন সে না বলে, যা অন্যদের সুস্থবিবেকবুদ্ধি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ম্যুর সাহেব এবং তার সমমনা লোকেরা যদি নিজেদের চোখ থেকে বিদ্বেষের রঙ্গিন চশমা সরিয়ে দেখতেন, তাহলে তারা বুঝতে পারতেন যে, কেবল এ বিষয়টিই অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর এসব বিবাহ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে হয়েছে, এ কথারই প্রমাণ যে, এগুলো দৈহিক চাহিদার কারণে ছিল না বরং এগুলোর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। বিশেষত এটি এক ঐতিহাসিক সত্য যে, তিনি তাঁর যৌবনের দিনগুলো এমন এক অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন যার ফলে তিনি আপন-পর সবার কাছ থেকে 'আমীন' উপাধী পেয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন আর প্রত্যেক পাঠক এবং ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির আবেগ এটিই হবে যে, এই বিষয়টি পাঠ করে আমি এক আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করি যে, যে বয়সে তাঁর এসব বিবাহ হয়েছে, তখন তাঁর ওপর স্বীয় নবুয়তের দায়িত্ব পালনের বোঝা সবচেয়ে বেশি ছিল আর নিজের অগণিত ও কঠিন দায়িত্ব পালনে তিনি পুরোপুরি মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, আর প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ভদ্র লোকের কাছে শুধুমাত্র এই দৃশ্যই এ কথার একটি প্রমাণ যে, তাঁর (সা.) এর এসব বিবাহ তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালনেরই একটি অংশ ছিল যা তিনি নিজের পারিবারিক আনন্দকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবলীগ এবং তরবিয়তের উদ্দেশ্যে করেছিলেন। একজন মন্দ ব্যক্তি অন্যের কর্মকাণ্ডে মন্দ নিয়্যতেরই সন্ধান করে আর নিজের নোংরামির কারণে অনেক সময় অপরের নেক উদ্দেশ্যকে অনুধাবনের শক্তিও রাখে না। কিন্তু একজন ভদ্র প্রকৃতির লোক এ কথা জানে এবং বুঝে যে, অনেক সময় একই কর্ম হয়ে থাকে যেটিকে একজন মন্দ ব্যক্তি মন্দ উদ্দেশ্যে করে থাকে কিন্তু সেই একই কাজ একজন পবিত্র ব্যক্তি পাক এবং পবিত্র নিয়তেও করতে পারে আর করে থাকে। এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ইসলাম ধর্মে বিবাহের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, নারী-পুরুষ নিজেদের কামনা-বাসনা বা দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য একত্রিত হবে, যদিও মানুষের বংশ রক্ষার জন্য পুরুষ এবং মহিলার মিলিত হওয়াও বিয়ের একটি বৈধ উদ্দেশ্য, কিন্তু এর পেছনে আরো অনেক পবিত্র উদ্দেশ্য রয়েছে। অতএব একজনের বিয়ের উদ্দেশ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে, যার জীবনের সকল উঠাবাসা তাঁর নিঃস্বার্থ এবং পবিত্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে, মন্দ লোকের মতো মন্দ ধারণার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া যদিও সেই ব্যক্তির মোটেই কোন ক্ষতি করতে পারে না যার সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করা হয় কিন্তু এটিকে এরূপ মতামত ব্যক্তকারী ব্যক্তির হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি অবশ্যই ধরে নেয়া যেতে পারে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এই আপত্তির উত্তরে আমি এছাড়া আর কিছু বলব না যে, **ওয়াল্লাহুল মুসতাআনু আলা মা তা'সেফুন**। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লাই সেই সত্তা যার কাছে তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)ও তাঁর এক নিকাহ্‌র খুতবায় বিয়েশাদির বিষয়ে একটি গুঢ় কথা তুলে ধরেছিলেন, সেটিও আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নিজের ফুফাতো বোনকে যায়েদ (রা.) এর কাছে বিয়ে দিয়েছেন। আমরা এটা বলতে পারি না যে, মহানবী (সা.) ইস্তেখারা করেন নি, দোয়া করেন নি, আল্লাহ্ তা'লার ওপরে ভরসা করেন নি, এই সমস্ত বিষয় মহানবী (সা.) অবশ্যই করে থাকবেন। তিনি ইস্তেখারাও করে থাকবেন, দোয়াও করে থাকবেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চেষ্টা প্রচেষ্টাকে ফলপ্রদ করেন নি। তিনি লিখেন অর্থাৎ গুঢ় কথা বর্ণণা করছেন যে, এর আসল কারণ ছিল, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছে এ বিষয়টি প্রকাশ করতে চাইছিলেন যে, মহানবী

(সা.) এর কোন পুত্র নেই, তা ঔরসজাত পুত্র হোক বা পালকপুত্র হোক। মানুষ সন্তান দত্তক নেয়, দেশীয় আইন অনুযায়ী তাকে পুত্র হিসেবে ধরা হয়। প্রাকৃতিকভাবে তার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু দেশীয় আইন এবং তখনকার রীতি অনুযায়ী তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল যেমন, যায়েদ। মানুষ তাকে ইবনে মুহাম্মদ মুহাম্মদের পুত্র বলতো। হযরত যয়নবের বিয়ের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এটি ঘোষণা করেছেন যে, ঔরসজাত সন্তানই প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকে। দেশীয় আইনের অধীনে যাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা হয় সে সত্যিকার সন্তান নয়। পালকসন্তান প্রকৃত সন্তান হয় না। আর শরীয়ত প্রকৃত সন্তানের জন্য যে বিধিবিধান রেখেছে তা-ও অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একমাত্র পথ ছিল যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে মহানবী (সা.) এর বিয়ে করা। আল্লাহ্ তা'লা যায়েদ এবং তার স্ত্রীর মাঝে সৃষ্ট বিভেদকে দূর হতে দেননি, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে তা দূর হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি তা দূর হতে দেন নি। অথচ মহানবী (সা.) এ বিষয়ে ইস্তেখারাও করেছিলেন আর দোয়াও করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসাও করেছিলেন আর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞা এটিই ছিল, যায়েদ নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করবেন আর মহানবী (সা.) এর সাথে তার (অর্থাৎ যয়নব) এর বিয়ে হবে যেন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, দেশীয় আইনের অধীনে দত্তক নেয়া সন্তান ঔরসজান সন্তানের ন্যায় হয় না। এই বিবাহের পিছনে ঐশী প্রজ্ঞা হিসেবে এটিও একটি সূক্ষ্ম কথা ছিল যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সাথে মহানবী (সা.) এর ব্যবহার কেমন ছিল এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল, মানুষের পুরোনো ধ্যানধারণার সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি দাস এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মাঝ থেকে যোগ্য লোকদের সম্মানের বিষয়টি অন্যান্য লোকদের তুলনায় হৃদয়কোনে বেশী জাগরুক রাখতেন। অতএব তিনি (সা.) বহু ক্ষেত্রে নিজের মুক্ত দাস যায়েদ বিন হারেসা এবং তার পুত্র ওসামা বিন যায়েদকে যুদ্ধাভিযানে আমীর বা নেতা নিযুক্ত করেছেন। আর জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ সাহাবীদেরকে তাদের অধীনে রেখেছেন। আর অবুঝ লোকেরা যখন নিজেদের পুরোনো ধারণার ভিত্তিতে তাঁর (সা.) এই কাজে আপত্তি করে তখন তিনি বলেন,

তোমরা ওসামাকে আমীর নির্ধারণ করার কারণে আপত্তি করেছ আর এর পূর্বে তোমরা তার পিতা যায়েদের আমীর হওয়া সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছ। খোদার কসম, যেভাবে যায়েদ আমীর হওয়ার অধিকারী এবং যোগ্য ছিল আর আমার সবচেয়ে প্রিয় লোকদের একজন ছিল অনুরূপভাবে ওসামাও আমীর হওয়ার যোগ্য এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সা.) এর এই কথায়, যা ইসলামের সত্যিকার সাম্যের শিক্ষার ধারকবাহক ছিল, সাহাবীদের মস্তক অবনত হয়ে যায় আর তারা বুঝে নেয় যে, ইসলাম ধর্মে কোন ব্যক্তির দাস বা দাসের পুত্র হওয়া, অথবা বাহ্যত কোন নীচু শ্রেণীর সদস্য হওয়া, তার উন্নতির পথে বাধ সাধতে পারে না বা প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আর সকল পরিস্থিতিতে আসল বা প্রকৃত মান তাকওয়া এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। আর এর চেয়েও বড় যে কাজ তিনি (সা.) করেছেন তা হলো, তিনি তার আপন ফুপুর কন্যা যয়নব বিনতে জাহাশকে যায়েদ বিন হারেসার সাথে বিয়ে দেন। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো কুরআনে যদি কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ হয়ে থাকে তাহলে তিনি হলেন এই যায়েদ বিন হারেসা।

ইসলামী রীতি অনুযায়ী দাসদের মুক্তির বিষয়ে তিনি আরো লিখেন, ইসলামী রীতিতে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে অনেক বড় একটি অংশ এমন লোকদের দেখা যায় যারা সব ক্ষেত্রে উন্নতির পরম মার্গে উপনীত হয়েছেন এবং তারা বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানদের নেতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। সাহাবীদের মাঝে যায়েদ বিন হারেসা একজন মুক্ত দাস ছিলেন। কিন্তু তিনি এতটা যোগ্যতা অর্জন করেছেন যে, মহানবী (সা.) তার যোগ্যতার কারণে বহু ইসলামী অভিযানে তাকে 'আমীরুল আসকার' অর্থাৎ পুরো সেনাবাহিনীর প্রধান বা সেনাপতি নির্ধারণ করেছেন আর বড় বড় সম্মানীত সাহাবী, এমনকি খালেদ বিন ওয়ালীদ এর মতো সফল সেনাপতিকেও তার অধীনস্ত রেখেছেন।

হযরত যায়েদ বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া ও খায়বারের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে যোগদান করেন। হযরত যায়েদ মহানবী (সা.) এর অভিজ্ঞ তিরন্দাজদের মাঝে গণ্য হতেন। মহানবী (সা.) যখন মুরেসীর যুদ্ধে যা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের দ্বিতীয় নাম, যা সীরাতুল হালাবিয়া অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে হয়েছিল, এর জন্য যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন আমি মহানবী (সা.) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর নয়টি এমন সরিয়া অভিযানে অংশ নিয়েছি, অর্থাৎ সেসব যুদ্ধ যাতে সেনাবাহীনির সাথে মহানবী (সা.) অংশগ্রহণ করেন নি, তাতে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমাদের ওপর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) যখনই যায়েদ বিন হারেসাকে কোন সেনাবাহীনির সাথে প্রেরণ করেছেন প্রত্যেকবার সেই বাহীনির আমীরই নিযুক্ত করেছেন। হযরত আয়েশা বলেন, হযরত যায়েদ যদি পরবর্তীতেও জীবিত থাকতেন, তিনি (সা.) তাকেই আমীর নিযুক্ত করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন,

সাফওয়ানের যুদ্ধ, যেটিকে বদরের প্রথম যুদ্ধও বলা হয় এবং যা দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে হয়, তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উশায়রার যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) এর মদিনায় আগমনের দশ দিন অতিবাহিত না হতেই মক্কার এক নেতা কুরয বিন জাবের ফেহরী কুরাইশদের একটি দলের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদিনার একটি চারণভূমিতে অতর্কিত আক্রমণ করে, আর মুসলমানদের উট ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায়। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে অবগত হতেই তৎক্ষণাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে নিজের অনুপস্থিতিতে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবনে বের হন আর বদরের পার্শবর্তী সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সে বেঁচে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধকে বদরের প্রথম যুদ্ধও বলা হয়। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছিল। উশায়রার যুদ্ধ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে বলছি যে, মহানবী (সা.) কুরাইশদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে মদিনা থেকে বের হন আর সমুদ্রের তীরবর্তী উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছেন। যদিও সেখানে কুরাইশদের সাথে মোকাবিলা হয় নি। কিন্তু সেখানে বনু মুদলাজ গোত্রের সাথে কতিপয় শর্তে চুক্তি হয়, অর্থাৎ পারস্পরিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, আর এরপর তিনি (সা.) মদিনায় ফিরে যান। উশায়রা সমুদ্রের তীরবর্তী একটি স্থান ছিল, সেখানে তিনি (সা.) গিয়েছিলেন এই খবর শুনে যে, কাফেররা সেখানে একত্রিত হচ্ছে আর হয়ত সেনাবাহিনী জড় করছে। তিনি (সা.) ভাবলেন বাহিরে গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করা উচিত বা তাদের

মোকাবিলা করা উচিত। যাহোক যুদ্ধ হয় নি তবে এ সফরের ফলে লাভ এটি হয়েছে যে, একটি গোত্রের সাথে তাঁর শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

'গাযওয়া' এবং 'সারিয়া'র কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে চাই কেননা কেউ কেউ তা জানে না। 'গাযওয়া' সেটিকে বলা হয় যে অভিযানে মহানবী (সা.) অংশগ্রহণ করেছেন, আর 'সারিয়া' বা 'বা'স' সেটিকে বলা হয় যাতে তিনি (সা.) অংশগ্রহণ করেন নি,। 'গাযওয়া' এবং 'সারিয়া' এই উভয়টির ক্ষেত্রে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, তরবারির যুদ্ধের জন্য বের হওয়া আবশ্যক নয়, বরং প্রত্যেক সেই সফর যাতে তিনি (সা.) যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটিকে 'গাযওয়া' বলা হয়; বিশেষভাবে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সফর না করলেও আর বাধ্য হয়ে পরে যুদ্ধ করতে হলেও, অনুরূপভাবে 'সারিয়া'র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অতএব প্রত্যেক 'গাযওয়া' এবং 'সারিয়া' যুদ্ধাভিযান নয়। উশায়রার যুদ্ধেও, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, কোন যুদ্ধ হয় নি।

বদরের যুদ্ধ শেষে সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে মদিনার পথে প্রেরণ করেন যেন তিনি আগে পৌঁছে মদিনাবাসীদের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। অতএব তিনি মহানবী (সা.) এর পূর্বে সেখানে পৌঁছে মদিনাবাসীদের বিজয়ের সংবাদ পৌঁছান, যার ফলে মদিনার সাহাবীরা এক দিকে ইসলামের এই মহান বিজয় লাভের কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, কিন্তু অপরদিকে তারা কিছুটা আক্ষেপও করেন যে এই মহান জিহাদ করার পুণ্য থেকে তারা নিজেরাই বঞ্চিত ছিলেন। এই সুসংবাদ সেই দুঃখকেও ভুলিয়ে দেয় যা যায়েদ বিন হারেসার আগমনের কিছুক্ষণ পূর্বে মহানবী (সা.) এর কন্যা রুকাইয়্যার মৃত্যুতে সাধারণভাবে মদিনার সমস্ত মুসলমান এবং বিশেষভাবে হযরত উসমানের হয়েছিল, যাকে মহানবী (সা.) অসুস্থাবস্থায় বাড়িতে রেখে বদরের যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন এবং যার কারণে হযরত উসমানও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

হযরত যায়েদ বিন হারেসার আরেকটি অভিযান, যার জন্য তৃতীয় হিজরী সনে জমাদিউল আখের মাসে কারাদা নামক স্থানে তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল -সেটির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

বনু সুলায়েম এবং বনু গাতফান এর আক্রমণ সমূহ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি লাভ হলে একটি হুমকিকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের শহর থেকে বের হতে হয়। এতদিন পর্যন্ত কুরাইশরা নিজেদের উত্তর দিকের বাণিজ্যের জন্য সাধারণত হেজাযের সমুদ্র তীরবর্তী পথে সিরিয়ার দিকে যেত কিন্তু এখন তারা এই পথ পরিত্যাগ করে, কেননা এই অঞ্চলের গোত্রগুলো মুসলমানদের মিত্র হয়ে গিয়েছিল আর কুরাইশদের জন্য দুস্কৃতির সুযোগ কম ছিল। বরং এমন পরিস্থিতিতে সমুদ্র তীরবর্তী এই পথকে তারা নিজেদের জন্য বিপদের কারণ মনে করতো। যাহোক এখন তারা সেই পথকে পরিত্যাগ করে নাজাদের পথ অবলম্বন করে যা ইরাকের সংযোগ সড়ক ছিল এবং যার আশেপাশে কুরাইশদের মিত্র এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রুরা বসবাস করতো। পূর্বের পথে মুসলমানদের সাথে যাদের চুক্তি হয়েছিল তারা ছিল, আর এই পথে অর্থাৎ যেটিকে কুরাইশরা অবলম্বন করেছে সেখানে তাদের সাথে যাদের চুক্তি হয়েছিল তারা ছিল, আর সেসব লোক এবং গোত্র বসবাসরত ছিল যারা মুসলমানদেরও প্রাণের শত্রু ছিল। সেই গোত্রগুলো ছিল সুলায়েম ও গাতফান। অতএব জমাদিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) সংবাদ লাভ করেন যে, মক্কার কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা নাজাদের পথ অতিক্রম করতে যাচ্ছে। জানা কথা যে, যদি কুরাইশদের কাফেলার সমুদ্র

তীরবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করাতে মুসলমানদের জন্য বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে তাহলে নাজাদের পথ দিয়ে তাদের অতিক্রম করাও তেমনই, বরং তার চেয়ে অধিক আশঙ্কাজনক ছিল, কেননা সমুদ্র তীরবর্তী পথের বিপরীতে এই পথে কুরাইশদের মিত্রদের বসবাস ছিল, যারা কুরাইশদের মতোই মুসলমানদের রক্তপিপাসু শত্রু ছিল। আর যাদের সাথে মিলে কুরাইশরা অতি সহজেই মদিনায় গুপ্ত হামলা করতে পারতো অথবা কোন ষড়যন্ত্র করতে পারতো। এছাড়া কুরাইশদের দুর্বল করা এবং তাদেরকে শান্তিচুক্তির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যও আবশ্যক ছিল যেন এই পথেও তাদের কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেতেই নিজের মুক্ত দাস যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে নিজ সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন।

কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলায় আবু সুফিয়ান বিন হরব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার মত নেতারাও শামিল ছিল। যায়েদ (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং সাবধানতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন আর নজদের কারাদা নামক স্থানে গিয়ে ইসলামের এসব শত্রুকে ধরে ফেলেন। আর এই অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হয়ে বা ঘাবড়ে গিয়ে কুরাইশরা কাফেলার ধন-সম্পদ এবং তাদের যে মাল-সামান ছিল তা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আর যায়েদ বিন হারেসা এবং তার সঙ্গীরা ব্যাপক মালে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে বিজয়ীর বেশে মদিনায় ফিরে আসেন। কতেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ফুরাত নামের এক ব্যক্তি কুরাইশদের এই কাফেলার নেতা ছিল, সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় আর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে (তাকে) মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু অপরাপর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, (সে) মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরীকদের গুপ্তচর ছিল কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদিনায় এসে যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) একটি অভিযান থেকে ফিরে আমার ঘরেই ছিলেন, হযরত যায়েদ আসেন এবং দরজায় কড়াঘাত করেন। মহানবী (সা.) তাকে স্বাগত জানান এবং তার সাথে কোলাকুলি করেন এবং তাকে চুমু খান। ৫ম হিজরীর শাবান মাসে যখন মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আহ্বান করেন তখন কতেক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। খন্দক বা পরীখার যুদ্ধের দিন মুহাজীরদের পতাকাও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর কাছে (হাতে) ছিল। (হযরত যায়েদের) এই স্মৃতিচারণ সম্ভবত আরো কিছুটা চলবে।

এছাড়া এখন আমি একটি হৃদয়বিদারক সংবাদের উল্লেখ করবো (হুযূর এখানে জানতে চান যে, জানাযা কি এসে গেছে?) মোবারক আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের দুহিতা স্নেহের মরিয়াম সালমান গুল গত ১৭ই জুন মাত্র ২৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মাত্র কয়েকদিন আগেই তার অসুস্থতা সম্পর্কে জানা যায়। শরীর বেশি খারাপ হওয়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্ত প্রাণরক্ষা হয়নি; ঐশী তকদীরই কার্যকর হয় । এই মেয়ে সম্পর্কে তার পরিচিত সকলেই একথা বলেছে যে, খুবই মিশুক এবং উত্তম চরিত্রের মেয়ে ছিল। নিয়মিত নামায পড়তো, সহানুভূতিশীলা এবং সেবাকারীনি ছিল। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। পিতামাতা এবং স্বামী ছাড়াও মরহুমা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের দু'টি কন্যা নায়াব ও যারইয়াব'কে রেখে গেছেন। নায়াবের বয়স পাঁচ বছর আর যারইয়াব হলো দেড় বছরের। একজন লিখছেন যে, মরিয়ম সালমান সাহেবার মাতা

গুল মোবারক সাহেবাকে গত ছয় সপ্তাহে তিনটি শোক সইতে হয়েছে অর্থাৎ, গুল মোবারক সাহেবার এক ভাই মারা গেছেন, এরপর গত মে মাসে বোন মারা গেছে আর এখন তার মেয়ে খোদার কাছে চলে গেছে। খোদা তা'লা তাকে ধৈর্য ও সহ্যশক্তি দান করুন। মরিয়ম সালমান সাহেবা তার জামাত এপসম এর সেক্রেটারী নও মোবাঈয়াত ছিল। খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারীনি হাসিখুশী ছিলেনএবং অভাবীদের নিয়মিত সাহায্য প্রদানকারীনি ছিলেন। তার হালকার লাজনার প্রেসিডেন্ট বলেন যে, স্নেহের মরিয়ম সালমান সেক্রেটারী নও মোবাঈয়াত হিসেবে খুবই ভালো দৃষ্টান্তপূর্ণ কাজ করছিলেন আর নবাগতা আহমদী মহিলাদের সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যে, নতুন আহমদী মহিলাদের আপনা-আপনি জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যেতো।

একজন নবাগতা আহমদী মহিলা ফরিদা নেলসন বলেন যে, আমার স্মরণ আছে, যখন আমি প্রথমবার মিটিং-এ যাই তখন আমার চিন্তা হচ্ছিল যে, আমি নিজেকে নিসঙ্গ অনুভব করবো কিন্তু আমাকে দেখামাত্রই মরিয়মের মুখে বিশাল একটি হাসি ফুটে উঠে আর হাসি মুখেই আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমাকে আলিঙ্গন করে আর পুরো সময়ই আমার সাথে বসে থাকে, এরপরও আমার বাড়িতে উপহার হিসেবে চকলেট নিয়ে এসেছিল এবং আমাকে জামাত এবং খিলাফতের কল্যাণরাজি সম্পর্কে বলতে থাকে।

একইভাবে আরো একজন নবাগতা আহমদী মহিলা আন্দালীব সাহেবা, তিনিও বলেন যে, আমার মতে প্রত্যেক সেক্রেটারী নও মোবায়েহ্'কে মরিয়মের মত হওয়া উচিৎ। কেননা আমার স্মরণ আছে, যখন প্রথমবার মরিয়মের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল সে এরূপ ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে আমাকে আলিঙ্গন করে যে, মনে হয় যেন আমি একজন স্নেহময়ী বোন পেয়ে গেছি। আমার মনে হল যেন আমি একজন স্নেহময়ী বোন পেয়ে গেছি। উনি আমার বাড়িতে আমার জন্য এবং আমার সন্তানদের জন্য ছোট-খাটো উপহার নিয়ে আসতেন। ফোনে এবং সাক্ষাতে সর্বদা আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বন্ধু-বান্ধব এবং মানুষের সাথে কথায় কথায় প্রায়শ খিলাফতের কল্যাণরাজি এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতেন। নবাগতা আহমদীদের সর্বোত্তম বন্ধু হয়ে যেতো, তাদের সাহায্য করতো, এরফলে জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে যাওয়ার আগ্রহ জন্মে আর এখন এই নবাগতা আহমদী বলছেন যে, তার-ই অর্থাৎ এই মেয়ের (মরিয়মের) তরবীয়তের ফলে এখন আমি এই হালকার জেনারেল সেক্রেটারী। নিজের সামান্য পকেট খরচ থেকে সামান্য কিছু সাশ্রয় করে সে মানবসেবার কাজও করতে থাকতো।

স্নেহের মরিয়মের পিতা মোবারক সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন, নিয়মিত খুতবা শুনতো, সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতো। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে (ইউকে জামাতের) মজলিসে শূরা ছিল আর মরিয়ম ছিল নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে, আমি তাকে বললাম, আমি লিখিতভাবে শূরায় যোগদান না করার অনুমতি নিয়ে নেই কিন্তু মরিয়ম বললো, না! আপনি আমার চিন্তা করবেন না আর আমার কারণে জামাতের অনুষ্ঠান ত্যাগ করবেন না, শূরায় যোগদান করুন, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা এই অঙ্গীকারই করেছি যে, ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ইংরেজিতে নযম বা কবিতা লিখতো আর একটি ইংরেজি কবিতার সারাংশ কিছুটা এরকম, "যখনই তুমি কোন পুণ্যের কাজ করতে আরম্ভ করবে তখন তোমাকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

তোমার নিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহ করবে, লোকদেরকে তাদের কাজ করতে দাও আর তুমি সৎকাজ করতে থাকো। অনুরূপভাবে সে খিলাফত সম্পর্কে উর্দূতেও একটি নযম লিখেছিল।

লণ্ডনের সেন্ট জর্জেস হাসাপাতালে যেখানে সে ভর্তি ছিল সেখানে তার যে নার্স বা সেবিকা ছিলেন একজন জার্মান মহিলা । তিনি বলেন, মরিয়মের সাথে কথা বলে আমার মনে হত যে, আমি কোন ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত করছি। গ্রীষ্মকালে যখন এখানে অনেক বেশি গরম পড়তো তখন সে নিজের ফ্রিজে পানির বোতল ভরে রাখতো এরপর ছুটির দিনে বাচ্চাদের সাথে (ঘরের) বাইরে বসে লোকদের পানি পান করানোর জন্য (বোতলের) ওপরে লিখে রাখতো, বিনামূল্যে পানি। অনেক ইংরেজ আসতো আর স্টল দেখে দাঁড়াতো এবং বিভিন্ন সামগ্রী নিতো। একজন ইংরেজ মহিলার কথা লিখেছেন যে, তিনি মরিয়মকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মাথায় এই ধারণা কীভাবে এলো যে, ঘরের বাইরে তুমি টেবিলের ওপর এসব জিনিষ অথাৎ পানি ও চকলেট ইত্যাদি রেখে ওপরে লিখে দাও যে, বিনা মূল্যের জিনিষ বা ফ্রি নিয়ে যাও। সে বলে বাচ্চাদের স্কুলে এক সপ্তাহের ছুটি আর আমি বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য পুরো সপ্তাহ জুড়ে এভাবেই স্টল লাগাবো। সেই ইংরেজ মহিলা বলেন, আমি বিনোদন আর শান্তির সন্ধানে বাচ্চাদের জন্য সহস্র সহস্র পাউণ্ড খরচ করে দূর-দূরান্তে নিয়ে যাই এরপরও আমি শান্তি পাই না। আমি জানতাম না যে, এভাবে ঘরে বসেও মানুষের সেবা করে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায়।

সর্বদা সালাম করা এবং অন্যের খবার-খবর নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। পরিচিতজন অথবা পাড়ার লোকদের সাথে কিছুদিন কথা না হলে ম্যাসেজ বা ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে তাদের খবরা-খবর নিতো। আরেকটি গুণ ছিল, সর্বদা অন্যের ভেতর ভালো গুণ সন্ধান করতো আর সেই ভালো বিষয়ের প্রশংসা করতো , সব সময় তার মুখে হাসি লেগে থাকতো। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর আস্থা ছিল এবং (সে) আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির জন্য অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীনি ছিলো। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া করুন আর ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন। যেভাবে এই মেয়ের স্বীয় খোদার কাছে প্রত্যাশা ছিল আল্লাহ্ তা'লা এরচেয়ে বেশি তাঁর প্রতি প্রেমময় ব্যবহার করুন আর স্বীয় ভালোবাসার ক্রোড়ে আশ্রয় দিন। তার পদমর্যাদা উন্নত করতে থাকুন এবং তার মেয়েদেরকেও সর্বদা স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে রাখুন। এবং সেসব দোয়া যা তিনি তার মেয়েদের অনুকূলে করে গেছে তা আল্লাহ্ তা'লা কবুল করুন। তার (মরহুমার) পিতামাতাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন, তারাও যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিতে পুরোপুরী সন্তুষ্ট থাকেন আর তার মেয়েদের আদর্শ লালন-পালনকারী হন আর তাদের সাহায্যকারী হন। তার (মরহুমার) স্বামীকেও মেয়েদেরকে মা ও বাবা উভয়ের স্নেহ প্রদানকারী করুন। আল্লাহ্ তা'লা পদমর্যাদা উন্নীত করতে থাকুন।

এখন জুমুআর পর ইনশাআল্লাহ্ স্নেহের মরহুমা মেয়ের জানাযারা নামায পড়াবো, সবাই এতে যোগ দিবেন। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াবো আর আপনারা যারা ভেতরে আছেন তারা এখানে ভেতরেই থাকবেন।